## সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ৫ম আয়াত সংখ্যাঃ (৩০-৩৭)

أَعُوذُ بِاللِّ مِنُ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ قَالَتِ الۡيَهُوۡدُ عُزَيۡرُ ابۡنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الۡمَسِيۡحُ ابۡنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوۡلُهُمۡ بِاَفۡوَاهِهِمۡ ۚ ৯ : ৩০
يُضَاهِـُٔوۡنَ قَوۡلَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ قَبۡلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ ۚ اَنّٰى يُؤۡفَكُوۡنَ

৩০. আর ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র, এবং নাসারারা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র এটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে!

উযাইর বলা হয়েছে "আযরা"কে (EZRA) ইহুদীরা তাঁকে নিজেদের ধর্মের মুজাদ্দিদ বা পুনরুজ্জীবনকারি বলে মানে। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ের লোক ছিলেন বলে মনে করা হয়। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুলাইমান (আ) এর পরে বনী ইসরাঈলের ওপর যে কঠিন দুর্যোগ নেমে আসে তার ফলে শুধু যে তাওরাত দুনিয়া থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, তা নয়, বরং বেবিলনের বন্দী জীবন যাপন ইসরাঈলী জনগণকে তাদের শরীয়াত ঐতিহ্য এবং জাতীয় ভাষা ইবরানীর সাথে পর্যন্ত অপরিচিত করে দিয়েছিল। অবশেষে এ উযাইর বা আযরা বাইবেলের আদি পুস্তক সংকলন করেন। তিনি শরীয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেন এ কারণেই বনী ইসরাঈল তাকে অত্যধিক ভক্তি করে। এ ভক্তি এতদূর বেড়ে যায় যে, কোন কোন দল তাকে আল্লাহর পুত্র পর্যন্ত বানিয়ে দেয়। এখানে কুরআন মজীদের বক্তব্য এ নয় যে, সমস্ত ইহুদী জাতি একজোট হয়ে আযরাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে। বরং কুরআন বলতে চায় ইহুদীদের আল্লাহ সম্পর্কিত বিশ্বাসের এত বেশী গলদ দেখা দেয় যে, আযরাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার মতো লোকও তাদের সমাজে পয়দা হয়ে যায়।

একটি বর্ননা ইবন কাসীর তাফসীর গ্রন্থে এসেছে তা নিম্নরুপঃ

এ আয়াতগুলোতেও মহা মহিমান্বিত আল্লাহ মুমিনদেরকে মুশরিক, কাফির, ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। মহান আল্লাহ বলেন, দেখো! আল্লাহর শত্রুরা কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করছে! ইয়াহূদীরা উযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলছে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধে যে, তার কোন পুত্র থাকবে! ঐ লোকেরা যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উযায়ের (আঃ) সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করেছিল তা এই যে, যখন আমালিকা সম্প্রদায় বানী ইসরাঈলের উপর জয়যুক্ত হয় এবং তাদের আলেমদেরকে হত্যা করে ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বন্দী করে ফেলে তখন ইলম উঠে যাওয়া, কিছু সংখ্যক আলেমের নিহত হওয়া এবং বানী ইসরাঈলদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে উযায়ের (আঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি এমনভাবে কাঁদতে শুরু করেন যে, তাঁর চোখের অশ্রু বন্ধই হয় না। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখের পাতাগুলোও ঝরে পড়ে। একদা এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় একটি মাঠের মধ্য দিয়ে গমন করেন। এমন সময় দেখতে পান যে, একজন মহিলা একটি কবরের পার্শ্বে বসে ক্রন্দন করছে এবং মুখে উচ্চারণ করছে- "হায়! এখন আমার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কি করে হবে?" এ দেখে উযায়ের (আঃ) সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এই লোকটির পূর্বে তোমার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কে করতেন?" সে উত্তরে

বলেঃ “আল্লাহ তা'আলা।” তখন তিনি তাকে বলেনঃ “তাহলে আল্লাহ তাআলা তো এখনো জীবিত রয়েছেন। তার তো কখনো মৃত্যু হয় না। তার এ কথা শুনে মহিলাটি উযায়ের (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ “তাহলে হে উযায়ের (আঃ)! আপনি বলুনতো- বানী ইসরাঈলের পূর্বে আলেমদেরকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন কে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা।” তখন মহিলাটি বলেঃ “তাহলে আপনি এভাবে কেঁদে কেটে সময় কাটাচ্ছেন কেন?” তিনি এবার বুঝে নেন যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। অতঃপর তাঁকে বলা হয়ঃ “তুমি অমুক নদীতে গিয়ে গোসল কর এবং দু'রাকআত সালাত আদায় কর । সেখানে তুমি একজন লোককে দেখতে পাবে। সে তোমাকে যা কিছু খেতে দেবে তা তুমি খেয়ে নিবে।” কথামত উযায়ের (আঃ) সেখানে গমন করেন। গোসল করে তিনি সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি সেখানে একটি লোককে দেখতে পান। লোকটি তাকে বলেনঃ “মুখ খুলুন!” তিনি মুখ খুলে দেন। তখন লোকটি পাথরের মত কি একটি জিনিস তিন বার তাঁর মুখে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বক্ষ খুলে দেন। ফলে তিনি তাওরাতের সবচেয়ে বড় আলেম হয়ে যান। তারপর তিনি বানী ইসরাঈলের কাছে গিয়ে বলেনঃ “আমি তোমাদের কাছে তাওরাত নিয়ে এসেছি।” তারা তাকে বলেঃ “হে উযায়ের (আঃ)! আপনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না।” এরপর তিনি অঙ্গুলির সাথে কলমকে জড়িয়ে ধরেন এবং ঐ অঙ্গুলি দ্বারাই একই সময় সম্পূর্ণ তাওরাত লিখে ফেলেন। এদিকে লোকেরা যুদ্ধ হতে ফিরে আসে। তাদের সাথে তাদের আলেমগণও ফিরে আসেন। তারা উযায়ের (আঃ)-এর ব্যাপারটা জানতে পারেন। সুতরাং তারা পাহাড়ে ও গুহার মধ্যে তাওরাতের যে পুস্তিকাগুলো লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন সেগুলো বের করে আনেন। ঐ পুস্তিকাগুলোর সাথে উযায়ের (আঃ)-এর লিখিত পুস্তিকাগুলো তারা মিলিয়ে দেখেন। দেখা যায় যে, ওগুলোর সাথে তার নুসখা সম্পূর্ণরূপে মিলে গেছে। এতে কোন কোন অজ্ঞ লোকের অন্তরে এই শয়তানী 'ওসওয়াসা পয়দা হয়ে যায় যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো (আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তার ঘটনা তো সর্বজন বিদিত। সুতরাং এ দু'টি দলের ভুল বর্ণনা কুরআন কারীমে বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক বলেন, এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই।

পূর্বে আয়াতে মোটামুটিভাবে বলা হয় যে, তারা আল্লাহর উপর ঈমান রাখে না। এখানে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা উযাইরকে আর নাসারারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। [ইবন কাসীর] তাই তাদের ঈমান ও তাওহীদের দাবী নিরর্থক। এরপর বলা হয়ঃ “এটি তাদের মুখের কথা” । এর অর্থ তারা মুখে যে কুফর উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি। কত মারাত্মক সে উক্তি যা তারা করে যাচ্ছে। অন্য আয়াতেও আল্লাহ তা বলেছেন, “এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে বের হওয়া বাক্য কী সাংঘাতিক। তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে।” [সূরা আল-কাহাফ: ৫]

অতঃপর বলা হয়ঃ এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। [ইবন কাসীর] এর অর্থ হল ইয়াহুদী ও নাসারারা নবীগণকে আল্লাহর পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাফের ও মুশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাত মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছিল। [বাগভী]

**اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَ مَاۤ اُمِرُوْۤا ٣١ : ٩**
**اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ**

**৩১. তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগিদেরকে তাদের রবরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়াম-পুত্র মসীহকেও। অথচ এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি কত না পবিত্র।**

أحبار শব্দটি حبر এর বহুবচন। ইয়াহুদীদের আলেমকে حبر বলা হয়। পক্ষান্তরে رهبان শব্দটি راهب এর বহুবচন। নাসারাদের আলেমকে راهب বলা হয়। তারা বেশীরভাগই সংসার বিরাগী হয়ে থাকে। [ফাতহুল কাদীর]

এ আয়াতে বলা হয় যে, ইয়াহুদী-নাসারাগণ তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহর পরিবর্তে রব ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ ঈসা আলাইহিস সালামকেও মা’বুদ মনে করে। তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাকে মা’বুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মা’বুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বান্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ তারা যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; যতই তা আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী হোক না কেন? বলাবাহুল্য পাদ্রী ও পুরোহিতগণের আল্লাহ বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মা’বুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর, আর এটি হল প্রকাশ্য কুফরী ও শির্ক।

আদী ইবনে হাতিম (রাঃ)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দ্বীন যখন পৌঁছে তখন তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। অজ্ঞতার যুগেই তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তার ভগ্নি ও তার দলের লোকেরা বন্দী হয়ে যায় । রাসূলুল্লাহ (সঃ) দয়া পরবশ হয়ে তার ভগ্নিকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও প্রদান করেন। সে তখন সরাসরি তার ভাই-এর কাছে চলে যায় এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে ও মদীনায় গমনের অনুরোধ করে। সুতরাং আদী (রাঃ) মদীনায় চলে আসেন। তিনি তার ‘তাঈ’ গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পিতার দানশীলতা দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর আগমনের সংবাদ অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর কাছে আসেন। ঐ সময় আদী (রাঃ)-এর স্কন্ধে রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ লটকানো ছিল ।

আদী ইবন হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি গলায় একটি সোনার ক্রুশ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেনঃ হে আদী, তোমার গলা থেকে এ মূর্তিটি সরিয়ে ফেল এবং তাকে সূরা আত-তাওবাহর এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুনলাম- “তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে।” আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো তাদের ইবাদত করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তারা তোমাদের জন্য কোন কিছু হালাল করলে তোমরা সেটাকে হালাল মনে কর আর কোন কিছুকে হারাম করলে তোমরা সেটাকে হারাম হিসাবে গ্রহণ কর। [তিরমিযীঃ ৩০৯৫]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরীআতের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে কেরামের নির্দেশনার অনুসরণ বা ইজতিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণর ততক্ষণই করতে পারবে যতক্ষণ না এর বিপরীতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে কোন কিছু প্রমাণিত হবে। যখনই কোন কিছু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মতের বিপক্ষে হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে তখনি তা ত্যাগ করা ওয়াজিব। অন্যথায় ইয়াহুদী নাসারাদের মত হয়ে যাবে। কারণ ইয়াহুদী-নাসারাগণ আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ নিষেধকে সম্পূর্ণ উপক্ষো করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। আয়াতে তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

অথচ তাদেরকে তো শুধু এ নির্দেশই দেয়া হচ্ছিল যে, তারা এক ইলাহেরই ইবাদত করবে, যিনি কোন কিছু হারাম করলেই কেবল তা হারাম হবে, আর যিনি হালাল করলেই তা হালাল হবে। অনুরূপভাবে যিনি শরীআত প্রবর্তন করলে সেটাই মানা হবে, তিনি হুকুম দিলে সেটা বাস্তবায়িত হবে। তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তারা যা তাঁর সাথে শরীক করছে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র। তাঁর সন্ততি নেই, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া কোন রব নেই। [ইবন কাসীর] কিন্তু তারা সে নির্দেশের বিপরীত কাজ করেছে। তার সাথে শরীক করেছে। মহান আল্লাহ তাদের সে সমস্ত অপবাদ ও শরীক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তার পূর্ণতার বিপরীত তার জন্য যে সমস্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ গুণ সাব্যস্ত করে তা গ্রহণযোগ্য নয়। [সা'দী]

আনুগত্যে শিরকের মধ্যে যেমন: শারিয়তের নাফরমানি ও অবাধ্যতার বিষয়ে আলেম সমাজ, ইমাম, শাসনকর্তা, রাষ্ট্রপতি ও পীর-বুজুর্গদের আনুগত্য করা। আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল বা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা। অতএব, এ ব্যাপারে তাদের যে আনুগত্য করবে সে তাদেরকে বিধান রচনায় ও হালাল-হারাম করার ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে শরিক বানালো। আর ইহা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

<u>অনুসারীরা নেতাদের প্রত্যাখ্যান করবে</u>

দুনিয়াতে যে সকল মানুষ আল্লাহকে বাদ অন্যের ইবাদত বন্দেগী করেছে কিয়ামতের দিন তারা তাদের অনুসারীদের প্রত্যাখ্যান করবে। এমনিভাবে আল্লাহর বিধি-বিধান না মেনে যে সকল নেতাদের নির্দেশ পালন করা হয়েছে তারাও সেদিন তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের সাহায্যকারী হতে পারে। কখনো নয়, এরা তাদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে" । [সূরা মারইয়াম: ৮১-৮২]

"যখন অনুসরনীয় ব্যক্তিরা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং তারা আযাব দেখতে পাবে। আর তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে, যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন তাদের আক্ষেপের জন্য, আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না" । [সূরা আল-বাকারা: ১৬৬-১৬৭]

শাসকের কোন অন্যায় কাজের আনুগত্য করা বা সহযোগিতা করা যাবে না। এমনকি তার অন্যায় কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না। বরং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিবাদ করতে হবে, শাসকের সামনে হক্ব কথা বলতে হবে, সঠিক পথে পরিচালনা করার চেষ্টা করতে হবে এবং হেদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট দু ‘আ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ‘সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই’ (শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬ ‘নেতৃত্ব’ অধ্যায়)। অন্য হাদীছে আছে, ‘তোমাদের মধ্যে অনেক আমীর হবে, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে (সে মুক্তিও পাবে না, নিরাপত্তাও পাবে না)। ছাহাবীগণ বললেন, তাহলে কি আমরা তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৪; মিশকাত, হা/৩৬৭১ ‘নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা’ অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭/২৩৩ পৃ.)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘আর তোমরা যখন তোমাদের শাসকদের নিকট থেকে এমন কিছু দেখবে, যা তোমরা অপসন্দ কর, তখন তোমরা তার কাজকে অপসন্দ কর; কিন্তু তাদের থেকে আনুগত্যের হাত ছিনিয়ে নিয়ো না’ (ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৫৫)। দাওরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইবনু তীন বর্ণনা করেন, ‘স্বৈরাচার শাসকদের সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হল, বিশৃংখলা-বিপর্যয় এবং সীমালংঘন ছাড়াই যদি তার থেকে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করা যায়, তাহলে তা অবশ্যই করা যাবে। অন্যথা ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব’ (ফাৎহুল বারী, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ১০)। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, اَلصَّبْرُ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ أَصْلٌ مِّنْ أُصُوْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ‘স্বৈরাচার শাসকদের উপর ধৈর্যধারণ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা ‘আতের মূলনীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি মূলনীতি’ (মিনহাজুস সুন্নাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৭)।

**يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ يَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ৯ : ৩২**

**৩২. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া আর কিছু করতে অস্বীকার করছেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।**

**هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ৯ : ৩৩**

**৩৩. তিনিই সে সত্তা যিনি তার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি আর সব দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।**

আল্লাহ তাআলা রসূল (সাঃ)-কে যে সত্য দ্বীন এবং হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা চায় যে, বিতর্ক ও মিথ্যারোপের মাধ্যমে তা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর তার উপমা হল এমন এক ব্যক্তির যে সূর্যের কিরণ অথবা চাঁদের জ্যোৎস্নাকে নিজের ফুৎকার দ্বারা নিভিয়ে ফেলতে চায়। সুতরাং এটা

যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনি যে সত্য দ্বীন আল্লাহ তাআলা রসূল (সাঃ)-কে দিয়ে পাঠিয়েছেন তা দুনিয়া থেকে মুছে বা মিটিয়ে ফেলা অসম্ভব। এ ধর্ম অন্যান্য সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী থাকবে; যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা সে কথা উল্লেখ করেছেন। 'কাফের' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল গোপনকারী। এই জন্য রাতকেও 'কাফের' বলা হয়; যেহেতু রাত নিজ অন্ধকার দ্বারা সমস্ত বস্তুকে গোপন করে নেয়। অনুরূপ কাফেররাও আল্লাহর 'নূর' (জ্যোতি)-কে গোপন করতে চায় অথবা নিজেদের হৃদয়ে কুফরী ও মুনাফিকী এবং মুসলিম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা লুকিয়ে রাখে, এই জন্য তাদেরকেও 'কাফের' বলা হয়।

আল্লাহর ফায়সালা যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করা হয়েছে তা সদা বিজয়ী থাকবেই। হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন তা উন্নত রাখতে। আর স্পষ্ট কথা যে, আল্লাহর ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছার উপর নিঃসন্দেহে বিজয়ী থাকবে। যদিও তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর হয় তবুও কিন্তু হিদায়াতের সূর্য মধ্য গগণে পৌছে যাবেই। আরবী অভিধানে কোন জিনিস গোপনকারীকে কাফির বলা হয়। এ কারণেই রাত্রি সব জিনিসকে গোপন করে দেয় বলে ওকেই কাফির বলা হয়।

ঐ আল্লাহ তাআলাই স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে হিদায়াত ও দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্য সংবাদ, সঠিক ঈমান এবং উপকারী ইলমই হচ্ছে হিদায়াত। আর উত্তম কার্যাবলী, যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা দেয় সেটাই হচ্ছে দ্বীনে-হক। এটা দুনিয়ার সমুদয় দ্বীনের উপর বিজয়ীরূপে থাকবে।

আরবী ভাষায় دين (দ্বীন) শব্দ কতিপয় অর্থ ধারণ করেঃ

একটি অর্থ হচ্ছে, আধিপত্য ও ক্ষমতা, মালিকানা ও প্রভুত্বমূলক মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও সার্বভৌম ক্ষমতা এবং অন্যদের ওপর সিদ্ধান্ত কার্যকারী করা।

দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আনুগত্য, আদেশ পালন ও দাসত্ব।

তৃতীয় অর্থ হচ্ছে অভ্যাস ও পন্থা-পদ্ধতি---- মানুষ যা অনুসরণ করে।

এ তিনটি অর্থের প্রতি খেয়াল এ আয়াতে 'দ্বীন' শব্দটি এমন কর্মপদ্ধতি ও আচরণকে বুঝায় যা মানুষ কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং কারো আনুগত্য গ্রহণ করার মাধ্যমে অবলম্বন করে। আর "দ্বীন" কে শুধু আল্লাহর জন্য নিবেদিত করে তাঁর দাসত্ব করার অর্থ হলো "আল্লাহর দাসত্বের সাথে মানুষ আর কাউকে শামিল করবে না বরং শুধু তাঁরই পূজা করবে, তাঁরই অনুসরণ এবং তাঁরই হুকুম আহকাম ও আদেশ পালন করবে।"

দ্বীন অর্থই কারো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে তার আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করা। এ শব্দটি যখন পন্থা বা পদ্ধতি অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় এমন পদ্ধতি যাকে ব্যক্তি অবশ্য অনুসরণীয় পদ্ধতি এবং তার যার নির্ধারণকারীকে অবশ্য অনুসরণযোগ্য বলে মেনে চলে। এ কারণে আল্লাহর নির্ধারিত এই পদ্ধতিকে দ্বীনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আইন বলার পরিষ্কার অর্থ হলো এটা শুধু সুপারিশ (Recomendation) ও ওয়াজ-নসীহতের মর্যাদা সম্পন্ন নয়। বরং তা বান্দার জন্য তার মালিকের অবশ্য অনুসরণীয় আইন, যার অনুসরণ না করার অর্থ বিদ্রোহ করা। যে ব্যক্তি তা অনুসরণ করে না সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আধিপত্য, সার্বভৌমত্ব এবং দাসত্ব অস্বীকার করে।

‘সব দ্বীন’ বলতে বুঝানো হয়েছে সেসব ব্যবস্থাকে যা দ্বীন হিসেবে গণ্য। এখানে আল্লাহ তা’ আলা যে কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন তা হচ্ছে শুধু এ দ্বীনের প্রচার করাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল একে দ্বীন হিসেবে গণ্য সমস্ত জীবনাদর্শের ওপর বিজয়ী করে দেয়া। অন্য কথায় জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের ওপর কোন বাতিল জীবনাদর্শ বিজয়ী হয়ে থাকবে আর বিজয়ী সে জীবনাদর্শ তার আধিপত্যাধীনে এ দ্বীনকে বেঁচে থাকার যতটুকু অধিকার দেবে এ দ্বীন সে চৌহদ্দির মধ্যেই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এ উদ্দেশ্যে নবী (সা.) এ দ্বীন নিয়ে আসেননি। বরং তিনি এ জন্য তা এনেছেন যে, এটাই হবে বিজয়ী জীবনাদর্শ। অন্য কোন জীবনাদর্শ বেঁচে থাকলেও এ জীবনাদর্শ যে সীমার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দেবে সে সীমার মধ্যেই তা বেঁচে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমার জন্যে ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিম দিককে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মতের রাজ্য এই সমুদয় স্থান পর্যন্ত পৌছে যাবে।”

নবী (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের হাতে পূর্ব ও পশ্চিম বিজিত হবে। তোমাদের নেতারা জাহান্নামী হবে, তারা ব্যতীত যারা পরহেজগার হবে এবং আমানতদাতার কাছে আমানত পৌছিয়ে দেবে।” তামীমুদদারী (রাঃ)। হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি- “অবশ্যই এই দ্বীন ঐ সব জায়গায় পৌছবে যেখানে রাত ও দিন পৌছে থাকে। এমন কোন কাঁচা ঘর ও পাকা ঘর বাকী থাকবে না যেখানে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ইসলামকে পৌঁছাবেন না। আল্লাহ তা'আলা সম্মানিতদেরকে সম্মান দেবেন এবং লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যারা ইসলামের মর্যাদা দেয় তারা সম্মান পাবে এবং কাফিররা লাঞ্ছিত হবে।” তামীমুদদারী (রাঃ) বলেনঃ “এটা তো আমি স্বয়ং আমার বাড়ীতেই দেখতে পেয়েছি। যে মুসলিম হয়েছে সে কল্যাণ ও বরকত এবং সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে, আর যে কাফির হয়েছে সে লাভ করেছে ঘৃণা ও অভিসম্পাত। তাদেরকে অপমানের সাথে জিযিয়া প্রদান করতে হয়েছে।”

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি- “ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর বাকী থাকবে না যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের কালেমাকে প্রবিষ্ট করবেন না। তিনি মর্যাদাবানদেরকে মর্যাদা দিবেন এবং লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যাদেরকে তিনি মর্যাদা দানের ইচ্ছা করবেন তাদেরকে তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন। আর যাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত করতে চাইবেন তারা তা মানবে না, কিন্তু তাদেরকে ঐ মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হবে।” আদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করে আমাকে বলেনঃ “তুমি ইসলাম কবুল কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে।” আমি বললাম, আমি তো একটা দ্বীন মেনে চলছি। তিনি বললেনঃ “তোমার দ্বীন সম্পর্কে তোমার চেয়ে আমারই জ্ঞান বেশী আছে।” আমি বললাম, সত্যই কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “সম্পূর্ণরূপে সত্য। তুমি কি রাকূসিয়া’ র অন্তর্ভুক্ত নও? তুমি কি তোমার কওমের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় কর না?” আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, এ কথা সত্য বটে। তিনি বললেনঃ “তোমার ধর্মে এটা তোমার জন্যে হালাল নয়।” তার এ কথা শুনামাত্রই আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ “তোমাকে ইসলাম গ্রহণে কিসে বাধা দিচ্ছে তা আমি বেশ ভাল রূপেই জানি। দেখো, তুমি শুধু এ কারণেই বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে যে, মুসলিমরা খুবই দুর্বল ও শক্তিহীন। সারা আরববাসী তাদেরকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু বলতো তুমি হীরা (রাজ্য) চেনো কি?” আমি উত্তরে বললাম, আমি হীরা (রাজ্য) কোন দিন দেখিনি বটে, তবে শুনেছি নিশ্চয়ই। তিনি

তখন বললেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ তা’আলা এই দ্বীনকে পূর্ণ করবেন। এমন কি একজন পর্দানশীল নারী উস্ত্রীর উপর আরোহণ করে হীরা হতে যাত্রা শুরু করবে। এবং কারো আশ্রয় ছাড়াই নিরাপদে মক্কা পৌছে যাবে ও বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করবে। আল্লাহর কসম! তোমরা কিসরার (পারস্য সম্রাট) কোষাগারগুলো জয় করে নিবে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসরা ইবনে হরমূযের (কোষাগার)? তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হরমূযের (কোষাগার)। তোমাদের কাছে ধন-সম্পদের এতো প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাবে না।” এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় আদী (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। দেখো, আজ হীরা সাম্রাজ্য হতে উষ্ট্রারোহীরা নির্ভয়ে ও কারো আশ্রয় ছাড়াই নিরাপদে মক্কায় পৌছে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছে। সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী (সঃ)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হয়েছে। কিসরার কোষাগার বিজিত হয়েছে। আমি স্বয়ং ঐ সেনাবাহিনীতে ছিলাম যারা ইরানের ইট দ্বারা ইট বাজিয়েছে, অট্টালিকাগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং কিসরার গুপ্ত কোষাগার দখল করে নিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল (সঃ)-এর তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হবে।” আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দিন ও রাত্রির গমনাগমন অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত না পুনরায় ‘লাত’ ও ‘উযযা’ র ইবাদত শুরু হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) (আরবী)-এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার ধারণা তো এই রয়েছে যে, এটা পূর্ণ কথা।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যা, এটা পূর্ণ হয়ে গেছে এবং যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা হবে তা পূর্ণই থাকবে। অতঃপর তিনি একটা পবিত্র বায়ু প্রেরণ করবেন, যার ফলে যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাবে। তারপর শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে কোন পুণ্য ও কল্যাণ নিহিত থাকবে না। সুতরাং তারা তাদের বাপ দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাবে।” (এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার জন্য যমীনকে একত্রিত করে (সঙ্কোচন করে) এনে দেখিয়েছেন। তাতে আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দেখতে পেয়েছি। আর নিশ্চয় আমার উম্মত ততটুকু করায়ত্ব করবে যতটুকু আমাকে জমা করে দেখানো হয়েছে। আর আমাকে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য) দুটি খনি প্রদান করা হয়েছে। (সোনা ও রুপার মালিক রোম সম্রাট সিজার ও পারস্য সম্রাট খসরুর সম্পদ)।

আর আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি তিনি যেন আমার উম্মতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে শেষ না করে দেন এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের ব্যতীত তাদের শত্রুকে চাপিয়ে না দেন, যাতে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে বা তাদের সম্মান নষ্ট হবে। আমার রব আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয় না। আমি আপনার উম্মতের জন্য আপনাকে এটা প্রদান করলাম যে, তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস করব না। আর তাদের উপর তাদের নিজেদের ছাড়া শত্রুদেরকে এমনভাবে চাপিয়ে দেব না, যাতে তাদের ধ্বংস হয়। যদিও তাদের বিরুদ্ধে সবস্থানের লোক একত্রিত হয় তবুও নয়। তবে তাদের একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করে রাখবে। [মুসলিম: ২৮৮৯]

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ وَلَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ ٪

তিনিই তো নিজ রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, তা মুশরিকদের জন্য যতই অপ্রীতিকর হোক। আস সফঃ ৯

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا

আল্লাহই তো সে মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট. সূরা ফাতহঃ ২৮

**يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ ৩৪ : ৯**
**يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ**
**اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ**

৩৪. হে ঈমানদারগণ! পন্ডিত ও সংসার বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই তো জনসাধারণের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায় এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

**يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا ৩৫ : ৯**
**مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ**

৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে সেগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে এবং সে সব দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে, বলা হবে, এগুলোই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। কাজেই তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তার স্বাদ ভোগ কর।

أحبَار শব্দটি حِبْر এর বহুবচন। এটা এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে কথাকে খুব সুন্দর করে পেশ করার দক্ষতা রাখে। আর সুন্দর ও নকশাদার পোশাককেও ثَوبٌ مُحَبِّر বলা হয়ে থাকে। এখানে উদ্দেশ্য ইয়াহুদী উলামা। رُهبَان শব্দটি رَاهِب এর বহুবচন যার উৎপত্তি رهبنة শব্দ থেকে। এ থেকে উদ্দেশ্য নাসারা উলামা। কারো কারো নিকটে এ থেকে উদ্দেশ্য হল, নাসারাদের সুফীগণ। উলামার জন্য তাদের নিকট বিশেষ শব্দ قسّيسين রয়েছে। ইয়াহূদী আলেমদেরকে আহবার এবং খ্রীষ্টান আবেদদেরকে রুহবান বলা হয় ৫:৬৩ ।

এই আয়াতে ইয়াহুদী আলেমদেরকে ‘আহবার’ আর কুরআন কারীমের (৫:৮২) এই আয়াতে খ্রীষ্টানদের আবেদদেরকে ‘রুহবান’ এবং তাদের আলেমদেরকে ‘কিস্সীস’ বলা হয়েছে।

এই উভয় শ্রেণীর ধর্মধ্বজীরা এক তো আল্লাহর কালামকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে লোকদেরকে তাদের ইচ্ছা মোতাবেক ফতোয়া ও বিধান দিত এবং এইভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বাধা প্রদান করত।
আর দ্বিতীয়তঃ এই পন্থায় তারা তাদের নিকট হতে অর্থ উপার্জন করত; যা তাদের জন্য হারাম ও বাতিল ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, বহু সংখ্যক মুসলিম উলামাদের অবস্থাও ওদের মতই। আর এ হল নবী (সাঃ)-এর

ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ। যাতে তিনি বলেছিলেন لتتّبعن سنن من كان قبلكم অর্থাৎ, ''তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তী উম্মতদের তরীকা অনুসরণ করবে। (বুখারীঃ ই' তিসাম অধ্যায়)

কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তারা বিচারকার্য ঘুষের উপর করত। [কুরতুবী] এভাবে তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা বাহানা সৃষ্টি করে নিজেরাই শুধু পথভ্রষ্ট হতোনা বরং সত্যপথ অন্বেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতো। [সা' দী] কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানের স্পৃহাও আর বাকী থাকে না। তাছাড়া তাদের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ মিথ্যাকেও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়। অথবা আল্লাহর দ্বীন বলে এখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] অর্থাৎ তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট হয়েছেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না এনে অর্থলোভে পড়ে আছে। অন্যদেরকেও তেমনি ইসলামে প্রবেশ করা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ থেকে বাঁধা দিচ্ছে। [কুরতুবী]

ইয়াহুদী নাসারা গোষ্ঠীর আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয় অর্থের লোভ লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে অর্থলিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজার কথা বর্ণিত হয়। এরশাদ হয়েছেঃ “যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন” । এখানে ''আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে'' বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা বিধানমতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে তাদের অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ''যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা রাখা সঞ্চিত ধন-রত্রের শামিল নয়।'' [আবু দাউদ: ১৫৬৪]। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোনাহ নয়।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ''প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে না হয় দোযখের দিকে।' ' (মুসলিম যাকাত অধ্যায়)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখে তাদেরকে সেই জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথরের ছেকার সুসংবাদ দিন, যা জাহান্নামের আগুনের দ্বারা দেয়া হবে। যা তাদের কারও স্তনের বোটার মধ্যে রাখা হবে, আর তা বের হবে দু কাঁধের উপরিভাগে। আর দু কাঁধের উপরিভাগে রাখা হবে যা স্তনের বোঁটার মধ্য দিয়ে বের হবে। **[মুসলিম: ৯৯২]**

বলাই বাহুল্য যে, পূর্বোক্ত শ্রেণীর ভ্রষ্ট উলামা ও সূফীদের পরে ভ্রষ্ট ধনবানরাই সাধারণ মানুষদের ভ্রষ্টতার জন্য অধিকাংশে দায়ী। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মন্দ থেকে হিফাযতে রাখুন। আমীন।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, তারপর সে যে সম্পদের যাকাত দিবে না, কিয়ামতের দিন তার সম্পদ তার জন্য চক্ষুর পাশে দুটি কালো দাগবিশিষ্ট বিষাক্ত সাপে পরিণত হবে, তারপর সেটি তার চোয়ালের দু' পাশে আক্রমন করবে এবং বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন। [বুখারী: ১৪০৩]

কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করার উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, যে কৃপন ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়; কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে প্রথমে ভ্রুকুঞ্চন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন ব্যক্তি তাঁর উটের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকে উত্তমভাবে এসে তাকে পা দিয়ে মাড়াতে থাকবে, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ছাগলের যাকাত দিবে না সে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল তার থেকেও উত্তমভাবে এসে তাকে তার খুর ও শিং দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকবে ... আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন তাঁর কাঁধে ছাগল নিয়ে উপস্থিত না হয়, যে ছাগল চিৎকার করতে থাকবে, তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুরই মালিক নই, আমি তো তোমার কাছে বাণী পৌছিয়েছি। আর তোমাদের কেউ যেন তাঁর কাঁধে কোন উট নিয়ে উপস্থিত না হয়, যা শব্দ করছে। তখন সে বলবে, হে মুহাম্মাদ! আমি বলব, আমি তোমার জন্য কোন কিছুর মালিক নই, আমি তো তোমাদেরকে পৌছিয়েছি। [বুখারী: ১৪০২; মুসলিম: ৯৮৮]

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوۡرِ عِنۡدَ اللّٰهِ اثۡنَا عَشَرَ شَهۡرًا فِیۡ کِتٰبِ اللّٰهِ یَوۡمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ ٩ : ٣٦
الۡاَرۡضَ مِنۡهَاۤ اَرۡبَعَۃٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِکَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ ۬ۙ فَلَا تَظۡلِمُوۡا فِیۡهِنَّ اَنۡفُسَکُمۡ وَ قَاتِلُوا
الۡمُشۡرِکِیۡنَ کَآفَّۃً کَمَا یُقَاتِلُوۡنَکُمۡ کَآفَّۃً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُتَّقِیۡنَ

৩৬. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন।। কাজেই এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করো না এবং তোমরা মুশরিকদের সাথে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে থাকে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।

আল্লাহর বিধান 'কিতাবুল্লাহ' থেকে উদ্দেশ্য হল 'লাওহে মাহফূয'। সৃষ্টির প্রারম্ভিক কাল থেকেই আল্লাহ তাআলা (বছরে) বার মাস নির্ধারিত করেছেন। তার মধ্যে চারটি মাস হল নিষিদ্ধ মাস, যাতে বিশেষ করে লড়াই-ঝগড়া নিষিদ্ধ।

এই কথাকে নবী (সাঃ) এইভাবে বর্ণনা করেছেন, ''যামানা ঘুরে-ফিরে পুনরায় সেই অবস্থাতে এসে গেছে যে অবস্থাতে তখন ছিল, যখন আল্লাহ তাআলা আকাশ-পৃথিবী রচনা করেছেন; বার মাসে এক বছর। যার মধ্যে চারটি হল নিষিদ্ধ মাস; তিনটি মাস ক্রমান্বয়ে যুলকা' দাহ, যুলহাজ্জাহ ও মুহাররাম। আর চতুর্থ মাসটি হল

রজব মুযার; যা জুমাদাল আখের ও শা'বান মাসের মধ্যস্থলে পড়ে। (বুখারীঃ কিতাবুত তাফসীর সূরা তাওবাহ পরিচ্ছেদ, মুসলিম ক্বাসামাহ অধ্যায়) ''যামানা ঘুরে-ফিরে পুনরায় সেই অবস্থাতে এসে গেছে' এর অর্থ হল আরবের মুশরিকরা মাসগুলিকে নিয়ে যে আগা-পিছা করত।

বিদায় হজ্জের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন: তিনটি মাস হল ধারাবাহিক– যিলকদ, যিলহজ ও মহররম, অপরটি হল রজব। [বুখারী: ৩১৯৭; মুসলিম: ১৬৭৯]

আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় সময় আবার ঘুরে তার নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফিরে এসেছে। যে পদ্ধতিতে আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিনের মত। মাসের সংখ্যা বারটি। তন্মধ্যে চারটি হচ্ছে, হারাম মাস। তিনটি পরপর যিলকদ, যিলহজ, ও মুহাররাম। আর হচ্ছে মুদার গোত্রের রজব মাস, যা জুমাদাস সানী ও শাবান মাসের মাঝখানে থাকে। [বুখারী ৪৬৬২; মুসলিম: ১৬৭৯]

অর্থাৎ মাসগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসুগলোর সাথে সম্পৃক্ত হুকুম আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের ইলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল রাখাই হল সঠিক দ্বীন। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা পরিবর্তন - পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের আলামত। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরীআতে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়, বরং রাব্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তারতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরীআতের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চন্দ্রমাসের হিসেব মতেই রোযা, হজ ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। [কুরতুবী]

তবে কুরআন মজীদ চন্দ্রের মত সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদন্ডরূপে অভিহিত করেছেন।

''তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, আর তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। সূরা আল-আনআমঃ ৯৬

আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়-অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘন্টা এমনকি মিনিট ও সেকেণ্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল বিশাল গোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

''সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রমকারী হওয়া। আর প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে।'' [সূরা ইয়াসীন: ৪০]

''সূর্য ও চাঁদ আবর্তন করে নির্ধারিত হিসেবে''। সূরা আর-রাহমান: ৫

‘‘তিনিই সূর্যকে দীপ্তিময় ও চাঁদকে আলোকময় করেছেন এবং তার জন্য মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বছর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এগুলোকে যথাযথ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে’’। সূরা ইউনুস: ৫

এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা- যাতে কখনো এক মিনিট ও এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হয় না- এটি একমাত্র আল্লাহ তা’আলারই দুটি মহান গুণ অপরিসীম শক্তি ও অপার জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। [মানার] এজন্যেই বাক্যের শেষে আল্লাহর দুটি গুণ বাচক নাম পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী’ উল্লেখ করা হয়েছে। তার অপার শক্তির কারণে সমস্ত কিছু তার অনুগত বাধ্য হয়েছে। আর তার পরিপূর্ণ জ্ঞানের কারণে কোন গোপন বা প্রকাশ্য সবকিছু তার আয়ত্বাধীন রয়েছে। [সা’দী]

অতএব চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েজ। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরীআতের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চন্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া, সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সবাই গোনাহগার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে।

<u>আরবি বারো মাসের নাম ও অর্থ</u>

মহররম (محرم): অর্থ নিষিদ্ধ বা পবিত্র। এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল।

সফর (صفر): অর্থ শূন্য। এ মাসে আরবরা যুদ্ধ বা ব্যবসার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন, ফলে ঘরবাড়ি শূন্য থাকত।

রবিউল আউয়াল (ربيع الأول): অর্থ প্রথম বসন্ত। নামকরণের সময় এ মাসে বসন্তকালের আগমন ঘটত।

রবিউস সানি বা রবিউল আখির (ربيع الثاني): অর্থ দ্বিতীয় বসন্ত। এটি বসন্তকালের দ্বিতীয় মাস।

জমাদিউল উলা (جمادى الأولى): অর্থ প্রথম শুষ্ক বা ঠান্ডা মাস। এ সময়ে তীব্র শীতে পানি জমে বরফ বা শুষ্ক হয়ে যেত।

জমাদিউস সানি বা জমাদিউল আখির (جمادى الآخرة): অর্থ শেষ শুষ্ক বা ঠান্ডা মাস। এটি শীত ও শুষ্কতার দ্বিতীয় মাস।

রজব (رجب): অর্থ সম্মান করা। এটিও একটি সম্মানিত মাস, এ সময়ে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল।

শাবান (شعبان): অর্থ শাখা-প্রশাখা বিস্তারকারী বা বিভক্ত হওয়া। এ মাসে আরবরা পানির খোঁজে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তেন। এছাড়া এটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী মাস।

রমজান (رمضان): অর্থ প্রচণ্ড গরম, দহনকাল বা পোড়ানো। এ মাসে পাপ তাপ পুড়িয়ে বান্দাকে পবিত্র করা হয়।

শাওয়াল (শ্ওয়াল): অর্থ উন্নত করা বা উটনী যখন গর্ভে লেজ উঁচু করে। এ মাসে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়।

জিলকদ বা ধুল কদাহ (ذو القعدة): অর্থ বসে থাকার মাস। এ সম্মানিত মাসে আরবরা যুদ্ধ ও ভ্রমণ থেকে বিরত হয়ে ঘরে বসে থাকতেন।

জিলহজ বা ধুল হিজ্জাহ (ذو الحجة): অর্থ হজের মাস। এ মাসেই মুসলমানগণ পবিত্র হজ পালন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা সমস্ত মুসলিম ঐ মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" হতে পারে যে, এটা পূর্ব হুকুম থেকে একটা স্বতন্ত্র হুকুম নয়। আবার এও হতে পারে যে, এটা একটা পৃথক ও নতুন হুকুম।

*** আল্লাহ্ তা'আলা হয়তো মুসলিমদেরকে উৎসাহিত ও জিহাদের প্রতি উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলছেন- তারা যেমন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সবাই চতুর্দিক থেকে সমবেতভাবে তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে, তদ্রুপ তোমরাও সমস্ত মুমিনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মুকাবিলা কর। এটাও সম্ভব যে, এই বাক্যে মুসলিমদেরকে নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যখন আক্রমণের সূচনা তাদের পক্ষ থেকে হবে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যার পবিত্রতা অলংঘনীয় তার অবমাননা কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাকে অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (২:১৯৪) এ আয়াতে রয়েছে এবং আরো রয়েছে।

"আর তোমরা তাদের (মুশরিকদের) সাথে মসজিদুল হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যদি তারাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর।" (২:১৯১)

সম্মানিত মাসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তায়েফ অবরোধ করার জবাব এটাই যে, এটা ছিল হাওয়াযেন গোত্র ও তাদের মিত্র বানু সাকীফ গোত্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। তারা এদিক ওদিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরোধী লোকদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। সুতরাং নবী (সঃ) তাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রাও আবার সম্মানিত মাসে ছিল না। এখানে পরাজিত হয়ে ঐ লোকগুলো পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে দুর্গ স্থাপন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ কেন্দ্রকে খালি করার উদ্দেশ্যে আরো সামনে অগ্রসর হন। তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করে এবং মুসলমানদের একটি দলকে হত্যা করে ফেলে। এদিকে মিনজীক প্রভৃতি গোত্রসমূহের মাধ্যমে অবরোধ অব্যাহত থাকে। প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখা হয়। মোটকথা, যুদ্ধের সূচনা সম্মানিত মাসে হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সম্মানিত মাসও চলে আসে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবরোধ উঠিয়ে নেন। সুতরাং যুদ্ধ জারি রাখা এক কথা এবং যুদ্ধের সূচনা হওয়া আর এক কথা। এর বহু নবীর রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস এসেছে সেগুলো আমি "সীরাত"-এর মধ্যে বর্ণনা করেছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানের অধিকারী।

اِنَّمَا النَّسِیۡٓءُ زِیَادَۃٌ فِی الۡکُفۡرِ یُضَلُّ بِهِ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا یُحِلُّوۡنَهٗ عَامًا وَّ یُحَرِّمُوۡنَهٗ ৯ : ৩৭
عَامًا لِّیُوَاطِـُٔوۡا عِدَّۃَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَیُحِلُّوۡا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُیِّنَ لَهُمۡ سُوۡٓءُ اَعۡمَالِهِمۡ ؕ وَ اللّٰهُ
لَا یَهۡدِی الۡقَوۡمَ الۡکٰفِرِیۡنَ

৩৭. কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া তো শুধু কুফরীতে বৃদ্ধি সাধন করা, যা দিয়ে কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। তারা এটাকে কোন বছর বৈধ করে এবং কোন বছর অবৈধ করে যাতে তারা আল্লাহ যেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে, ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে; আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।

প্রাক-ইসলামি আরবে 'নাসী' (النَّسِيء) বলতে বোঝানো হতো বর্ষপঞ্জির মাসগুলোকে এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়া কিংবা স্থগিত করার নিয়ম। আরবের ‘নাসী’ ছিল দু ধরনের।

একঃ নাসীর প্রেক্ষিতে আরববাসীরা যুদ্ধ বিগ্রহ, লুট-তরাজ ও হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য কোন হারাম মাসকে হালাল গণ্য করতো এবং তার বদলে কোন হালাল মাসকে হারাম গণ্য করে হারাম মাসগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করতো।

আর দ্বিতীয় ধরনের নাসীর প্রেক্ষিতে তারা চান্দ্রবর্ষকে সৌরবর্ষ সদৃশ করার জন্য তাতে কাবীসা নামে একটা মাস বাড়িয়ে দিতো। তাদের উদ্দেশ্যে হতো, এভাবে হজ্জ সবসময় একই মওসুমে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। ফলে চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে হজ্জ অনুষ্ঠিত হবার ফলে তাদের যে কষ্ট করতে হতো তা থেকে তারা রেহাই পাবে। এভাবে ৩৩ বছর ধরে হজ্জ তার আসল সময়ে অনুষ্ঠিত না হয়ে অন্য তারিখে অনুষ্ঠিত হতো এবং শুধুমাত্র ৩৪ বছরের মাথায় একবার যিল হজ্জ মাসের ৯-১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হতো।

এই সিদ্ধান্তের মূল দায়িত্বে ছিল প্রাক-ইসলামি আরবের বনু কিনানাহ গোত্রের 'আল-কালামাস' উপাধিধারী ব্যক্তি ও তাদের বংশধররা।

নবী (সা.) বিদায় হজ্জের সময় তার প্রদত্ত খুতবায় একথাটিই ছিলেনঃ

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

"এ বছর হজ্জের সময় ঘুরতে ঘুরতে ঠিক তার প্রকৃত হিসেব অনুযায়ী আসল তারিখে এসে গেছে। “

এ আয়াতে 'নাসী'কে নিষিদ্ধ ও হারাম গণ্য করে আরবের মূর্খ লোকদের উল্লেখিত দু’ টি উদ্দেশ্য ও স্বার্থান্বেষণকেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম উদ্দেশ্যটি তো একটি সুস্পষ্ট গুনাহ ছিল। এ ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই। এর অর্থ তো এটাই ছিল, আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালালও করে নেয়া হবে আবার কৌশল করে আইন মেনে চলার একটি বহিঃকাঠামোও তৈরী করে রেখে দেয়া হবে।

আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি আপাত দৃষ্টিতে নির্দোষ ও কল্যাণ ভিত্তিক মনে হলেও আসলে এটাও ছিল আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ। মহান আল্লাহ তার আরোপিত ফরযগুলোর জন্য সৌর বর্ষের হিসেবের পরিবর্তে চান্দ্রবর্ষের হিসাব অবলম্বন করেছেন যেসব গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ কারিতার ভিত্তিতে তিনি এসব করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে, তার বান্দা কালের সকল প্রকার আবর্তনের মধ্যে সব রকমের অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে তার হুকুম আহকাম মেনে চলতে অভ্যস্ত হবে। যেমন রমযান, কখনো আসে গরমকালে, কখনো বর্ষাকালে আবার কখনো শীতকালে।

ঈমানদাররা এসব পরিবর্তিত অবস্থায় রোযা রেখে অনুগত থাকার প্রমাণও পেশ করে এবং এ সঙ্গে সর্বোত্তম নৈতিক প্রশিক্ষণও লাভ করে। অনুরূপভাবে হজ্জও চান্দ্রমাসের হিসেব অনুযায়ী বিভিন্ন মওসুমে আসে। এসব মওসুমের ভালো-মন্দ সব ধরনের অবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করে বান্দা আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উতরে যায় এবং বন্দেগীর ক্ষেত্রে পরিপক্কতা অর্জন করে।

এখন যদি এক দল লোক নিজেদের সফর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও মেলা-পার্বণের সুবিধার্থে চিরদিনের জন্য অনুকূল মওসুমে হজ্জের প্রচলন করে, তাহলে সেটা হবে এরূপ যেন মুসলমানরা কোন সম্মেলন করে সিদ্ধান্ত নিল যে, আগামী থেকে রমযান মাসকে ডিসেম্বর বা জানুয়ারীর সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। এর পরিষ্কার মানে দাঁড়ায়, বান্দারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেরাই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে গেছে। এ জিনিসটিরই নাম কুফরী। এছাড়াও একটি বিশ্বজনীন দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য এসেছে তা কেন সৌরমাসকে রোযা ও হজ্জের জন্য নির্ধারিত করবে? যে মাসটিই নির্ধারিত হবে সেটিই পৃথিবীর সব এলাকার বাসিন্দাদের জন্য সমান সুবিধাজনক মওসুম হবে না। কোথাও তা পড়বে গরম কালে, কোথাও পড়তে, শীতকালে, কোথাও তখন হবে বর্ষাকাল, কোথাও হবে খরার মওসুম কোথাও তখন ফসল কাটার কাজ চলবে আবার কোথাও চলবে বীজ বপন করার কাজ।

এ সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, ৯ হিজরীর হজ্জের সময় 'নাসী' বাতিল করার এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। পরের বছর ১০ হিজরীতে চান্দ্র মাসের হিসেব অনুযায়ী ঠিক নির্ধারিত তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত সঠিক তারিখেই হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

Sisters'Forum in Islam